প্রথম অধ্যায় ঃ

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্ব ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্ব ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে বুঝানো হত সর্বদা বিদেশী শাসকদের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই তাহা ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র।" [১]

বস্তুত ভারতবর্ষের বিদেশী শাসন, ভারতবর্ষকে ঘোর অন্ধকার এবং আতঙ্কের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যেখানে দেশের মানুষের সুখ দুঃখ চাপা পড়ে আছে। হুসেন শাহী যুগ থেকে বাংলায় পর্তুগীজরা বাণিজ্য করতে আসে। ক্রমে পর্তুগীজ বণিকদের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর কাসিম খান জুয়িনকে বাংলার সুবেদার করেন। কাসিম খান শক্ত হাতে পর্তুগীজদের দমন করেন। এরপর কাসিম খানের মৃত্যু হলে শাহজাহান তার দ্বিতীয় পুত্র সুজাকে বাংলার সুবেদার করে পাঠায়। তখন ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী শাহ সুজার কাছ থেকে বাড়তি সুযোগ লাভ করেছিল, এবং বাণিজ্যের পাশাপাশি ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ঔরঙ্গজেব সুজাকে আক্রমণ করে পরাজিত করে মীর জুমলাকে বাংলার সুবেদারের দায়িত্ব দেন। যে পর্তুগীজদের পথ ধরে ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছিল সে পর্তুগীজ জলদস্যুদের ঠেকাবার জন্য ইংরেজদেরকে হাতে রাখতে চাইলেন ঔরঙ্গজেব। উদ্দেশ্য ছিল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। কিন্তু জলদস্যুদের ঠেকাবার জন্য যে জলদস্যুদের ব্যবহার করার চিন্তা ঔরঙ্গজেব করলেন, পরবর্তীকালে সে জলদস্যুরা যে সুযোগ পেলে লুটতরাজ করবে তাতে সন্দেহ কি ? এ বিষয়টা ভাবেন নি ঔরঙ্গজেব। তা ছাড়া পর্তুগীজদের দমানো একক ভাবে মোগলদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। মোগলরা ছিল স্থল যোদ্ধা। যে সময় ইব্রাহীম খাঁ চার্নককে মাদ্রাজ থেকে বাংলায় পুনরায় ফিরে আসার অনুরোধ জানালেন আগের মত সুযোগ সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তখন ইংরেজ চরিত্র সম্পর্কে ইব্রাহীম খাঁ যে একেবারে অজ্ঞ তা নন। কারণ এর পূর্বে শায়েস্তা খাঁর আমলে ইংরেজরা লুট করেছে হুগলী। দখল করেছে বালেশ্বর। শায়েস্তা খাঁ কাশেম খাঁকে দিয়ে চার্নকের হিজলীর ডেরাকে আক্রমণ করিয়ে ছিলেন। সুচতুর শায়েস্তা খান ১৬৬৪ থেকে ১৬৮৮ পর্যন্ত বাংলার সুবেদার হিসাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় শায়েস্তা খান বাংলা থেকে জলদস্যুদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম দখল করেন, ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাত থেকে বাংলা মুক্ত করেন এবং ইংরেজদেরকে বাংলা সুবা থেকে বিতাড়িত করেন।

ইংরেজদের সম্পর্কে বাদশা ঔরঙ্গজেবের মনোভাবটা নরম টের পেয়ে ইব্রাহীম খাঁ মাদ্রাজ থেকে পুনরায় ফিরে আসার অনুরোধ জানালেন চানর্ককে। আগের মতোই সুযোগ সুবিধে দেবেন ব্যবসার। আগের মতই বছরে তিন হাজার টাকার খাজনা। চানর্ক ফিরে এলেন।

১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। ১৭১০ সালে বাংলার দেওয়ান হয়ে ফিরে আসেন মুর্শিদকুলি খাঁ। ১৭১২ সালে মৃত্যু হয় সম্রাট বাহাদুর শাহ'র। ১৭১৩তে ফারুক শিয়রের ছেলে আজিমুস্সান বসল দিল্লীর সিংহাসনে অনেক রক্তারক্তি করে। কলকাতায় ইংরেজরা ততদিনে বেশ জেঁকে বসেছে। মুর্শিদকুলি খাঁ সিদ্ধান্ত নিলেন ইংরেজদের দাপট তুলে দেবেন। কিন্তু সে সুযোগ মুর্শিদকুলি খাঁ পেলেন না। ইংরেজরা ফারুক সিয়রকে ষোল হাজার টাকা ঘুষ জুগিয়ে মাত্র ষোলশ টাকা দিয়ে কিনে নেয় সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতা এ তিনটি গ্রাম। সওদাগর ইংরেজরা এবার হয়ে গেল জমিদার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তারা কিন্তু জমিদারী চায়নি, তারা চেয়েছে ব্যবসা। জমিদারি কেনার খবরটা যখন লণ্ডনে গিয়ে পৌছল কোম্পানীর কর্তারা তুষ্ট হয়নি, জানালেন, জমিদারিটারি বাদ দিয়ে ব্যবসায় মন দাও। কলকাতার ইংরেজরা সে কথায় কান দিলেন না। কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টসের কাছে লক্ষ্য ছিল সব সময় ব্যবসা। কিন্তু তাদের পাঠানো লর্ড – গভর্ণররা চেয়েছে সব সময় ক্ষমতা। কোম্পানীর লক্ষ্য ব্যবসা, কর্মচারীদের লক্ষ্য ক্ষমতা, দুই লক্ষ্যের শিকার হয়ে ভারতবর্ষ হয়েছে একদিকে পরাধীন, অন্যদিকে নিঃস্ব। ইংরেজদের দুর্গ, কামান, কুঠি, অর্থ ভাবিয়ে তুললো নবাব আলিবর্দী খাঁকে। সচেতন আলিবর্দী খাঁ সতর্ক করে দিলেন দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকেও। সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের দৌরাত্মকে শায়েস্তা করতে আক্রমণ করলেন ফোর্ট উইলিয়ামকে। কলকাতা থেকে উৎখাত করলেন ইংরেজ দাপট। এর কিছু দিন পর মাদ্রাজ থেকে ফিরে এলেন কর্ণেল ক্লাইভ। সিরাজের সাথে টেক্কা দিতে। সিরাজের তখন ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু, ষড়যন্ত্রী ক্লাইভ পদে পদে উৎকোচ এবং প্রলোভন যুগিয়ে ইংরেজদের ভিত্তি শক্ত করলেন বাংলার বুকে। তরুণ সিরাজ পরাজিত হয় পলাশীর মাঠে ক্লাইভ এবং মীরজাফরের মিলিত চক্রান্তে। পলাশীর প্রান্তরে একটা যুদ্ধের নাটক করে ইংরেজ শাসনের বীজটি প্রথম বপন করে দেয় ক্লাইভ। বাংলার ক্ষমতায় আসে মীর জাফর। নামে মাত্র। ক্ষমতার মূল চাবি কাঠি ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের আগমণ মুনাফা লাভের অভিপ্রায়ে। কিন্তু তারা এদেশে এসে লক্ষ করে এদেশে শাসক এবং শাসন দুয়েরই ব্যাপক ভাঙন চলছে। সুযোগ দেখে জেগে উঠে তাদের সাম্রাজ্যবাদী মন। প্রথম দিকে ইংরেজরা সাহস করেনি ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করতে। ভারতবর্ষের তখন তহবিল প্রায় শূন্য। দীর্ঘকাল হতে মোগলের সৈন্যরা বেতন ভাতা না পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় অন্নের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপর দিকে এ সুযোগে সাম্রাজ্যের সুবেদার, জায়গীরদার, কর আদায়কারী জমিদার, গোমস্তার দল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের আশায় মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। এসময় খাজনা এবং করের অংশ রাজকোষে না পৌঁছলেও সাধারণ জনগণ এবং কৃষকের উপর করের পেষণ ঠিকই ছিল। এবং বর্ধিত হচ্ছিল ক্রমান্বয়ে। এমনকি এর সাথে যুক্ত হয় - সুবেদার, জায়গীরদার, জমিদার এবং আমলা কর্মচারীদের অবাধ লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন। ফলে মোগল শাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের শেষ আস্থাটুকুও বিলুপ্ত হয়। এসময় ইংরেজ শক্তির জয়লাভ সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এ দেশের বৃহৎ গোষ্ঠী সাধারণ জনগণ পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ নবাবের যুদ্ধের সাথে যে পরাধীনতা এবং তাদের ভাগ্য বিপর্যয় জড়িত তা তাদের চেতনায় আসে নি। তাই পলাশীর মাঠে একটা যুদ্ধের অভিনয় করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অতি সহজে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা ও বিহারের ক্ষমতা দখল করে বসে।

সিরাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

> "রাজমর্যাদাভিমানী নবাবের সহিত ধনলোলুপ বিদেশী বণিকের দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিল। এই দ্বন্দ্বে বণিক পক্ষের গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। সিরাজদ্দৌলা যদিচ উন্নত চরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি এই দ্বন্দ্বের হীনতা-মিথ্যাচার প্রতারণার উপরে তাহার সাহস ও সরলতা, বীর্য ও ক্ষমা, রাজোচিত মহত্বে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। তাই ম্যালিসন তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'সেই পরিণাম দারুণ মহা নাটকের প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে সিরাজদ্দৌলাই এক মাত্র লোক, যিনি প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই"।[২]

সিরাজদ্দৌলা ছিলেন বাংলার মূলত শেষ নবাব। কারণ সিরাজুদ্দৌলার পরে মীরজাফর থেকে ওয়ারেশ আলী পর্যন্ত যারা নবাব ও নাজিম ছিলেন, তারা ছিলেন নামের নবাব। মীর-কাসেম অবশ্য স্বাধীনতাপ্রিয় এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন।

ভারতীয় সাম্রাজ্যে ইংরেজ শক্তির আবির্ভাবের মূলে পলাশীর যুদ্ধ বড়ো নয়। এর মূলে ছিল এদেশের শাসকদের এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণীর পরস্পরের সাথে হানাহানি। যার ফলে বিদেশী ইংরেজের উন্নত শক্তির আক্রমণের প্রতিরোধের ক্ষমতা কারো ছিল না। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্স বলেছেন -

"মোগল সম্রাটের সামন্ত প্রতিনিধিরাই মোগল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে। সেই প্রতিনিধিদের ক্ষমতা চূর্ণ হয় মারাঠাদের হাতে, আর মারাঠা শক্তি চূর্ণ হয় আফগানদের দ্বারা। এই ভাবে যখন সকলেই সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন বৃটিশ শক্তি দ্রুত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া সকলকেই পরাভূত করিতে সক্ষম হয়। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, যাহা কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই বিভক্ত নয়, এদেশটা বিভক্ত গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, জাতিতে-জাতিতে। ইহা এমন একটা সমাজ, যাহার কাঠামোটা যে ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ভারসাম্যের সৃষ্টি ঐ সমাজের সকল সত্যের একটা অবসাদগ্রস্ত বৈরাগ্য ও চরিত্রগত সুতন্ত্রতা হইতে। কোন বৈদেশিক শক্তির পর - রাজ্য-লোলুপতার শিকারে পরিণত হওয়া সেই দেশ ও সেই সমাজের বিধিলিপি না হইয়া কি পারে ?" [৩]

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ইংরেজদের আগমনটা আকস্মিক। পলাশীর যুদ্ধের আগে ইংরেজদের সাথে মীরজাফরের গোপন চুক্তি হয়। সে চুক্তি অনুযায়ী মীরজাফর চব্বিশ পরগণা জেলার জমিদারী কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ইংল্যান্ডে ফিরে যান। ইংরেজদের চাহিদা মত অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে নতুন গভর্নর ভেন্সিটার্ট মীর জাফরকে সরিয়ে ক্ষমতায় বসায় মীরকাসেমকে। মীর কাসেম গোপন চুক্তি অনুযায়ী পূর্বের শর্তমত অর্থ কোম্পানীকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়াও বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার জমিদারীও ইংরেজদের দিয়ে দেয়। ইংরেজরা মীরজাফরের মত মীরকাসেমকেও পুতুল নবাব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মীরকাসেম ছিলেন কিছুটা স্বাধীনচেতা, ফলে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ বাধে, মীরকাসিমের সাথে যুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজরা অনেক সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে দ্বিতীয় বারের মত মীরজাফরকে সিংহাসনে বসায়। এর পর ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে মীরজাফরের পুত্র নজমুদ্দৌলাকে ইংরেজরা বাংলার মসনদে বসাবার সময় চুক্তি করে - বাংলার সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা থাকবে 'নায়েব-ই-নাজিম'

উপাধিধারী একজন মন্ত্রির হাতে আর তার নিয়োগ এবং অপসারণ করার পুরো ক্ষমতা থাকবে ইংরেজদের হাতে। এভাবে বাংলার প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে।

রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয় বারের মত বাংলার গভর্ণর হয়ে আসার পর সরাসরি বাংলার ক্ষমতায় বসার ব্যবস্থা করেন। বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার বিনিময়ে কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে এবং বাংলার শাসন কার্য পরিচালনার জন্য নবাবকে তিপ্পান্ন লাখ টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইংরেজরা সৈয়দ মুহাম্মদ রেজা খান নামে এক রাজস্ব বিশারদকে নায়েব-ই-দেওয়ান হিসাবে নিয়োগ করে। রাজস্ব আদায়ের দায় দায়িত্ব তার, কিন্তু রাজস্বের হার বাড়ানো কমানোর অধিকার বা দায়িত্ব কোম্পানীর। অধিক অর্থ আদায়ের জন্য বাংলার সাধারণ কৃষকের উপর নেমে এল অত্যাচার। ক্লাইভ এদেশের প্রথম শ্বেত নবাব। ক্লাইভকে শাসক বলা যায় না। কারণ শাসক কর নিতে পারে, উৎকোচ নয়। কিন্তু ক্লাইভ পলাশী যুদ্ধে বেশ কিছু সৈন্য এবং অস্ত্র ভাড়া দিয়েছে মীরজাফরকে এবং নিজেও ভাড়াটে সেনা নায়ক সেজেছে। তার ভাড়া প্রদানে নবাবের রাজকোষের অবস্থা হয় কাহিল। ক্লাইভ এদেশের শাসন মঞ্চে অবতীর্ণ হয় দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক হিসেবে।

"পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ মীরজাফরের নিকট হইতে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ করিয়া ক্লাইভ রাতারাতি ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন বলিয়া গণ্য হইল। মীরজাফরের নবাবী লাভের 'ইনাম' স্বরূপ ইংরেজ কর্মচারীরা লাভ করিল চব্বিশ পরগণা জেলার জমিদারী ও নগদ ৩০ লক্ষ পাউন্ড। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অবাধে চলিল কোম্পানীর শ্বেত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত উৎকোচ গ্রহণ, ব্যবসায়ের নামে কোম্পানীর অবাধ লুণ্ঠন ও ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায়। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজ পার্লামেন্ট দ্বারা নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতেই দেখা যায় যে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার হইতে মোট ৬০ লক্ষ পাউন্ড উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল।" [৪]

শুধু ক্লাইভ নয়, যে যেদিকে সুযোগ পেয়েছে মুনাফা অর্জনের কিংবা উৎকোচ গ্রহণের সামান্যতম ও বিবেকের দ্বারস্থ না হয়ে তা কাজে লাগিয়েছে। তৎকালীন শাসক গোষ্ঠির এমন অমানবিক মানসিকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ভারতবর্ষের দুর্নীতির প্রচলন এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগ। এর সুদূরপ্রসারী ফল একটার পর একটা মন্বন্তর ডেকে এনেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজদের শোষণ অর্থনীতি, বিভিন্ন মন্বন্তরের একটা পরোক্ষ কারণ।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন এবং মুসলমান শাসনের মাঝে একটি পার্থক্য বিদ্যমান। মুসলমান শাসকরা এদেশকে যে শুধু শাসন করেছে তা নয়, তারা এখানে বসতি স্থাপন করেছে। এখানকার সংস্কৃতি হয় গ্রহণ করেছে, নয় তাদের সংস্কৃতি এখানে চালু করেছে। তাদের দ্বিতীয় কোন দেশ ছিল না, যেখানে তারা সম্পদ পাচার করতো, এদেশকে ধ্বংস করে সে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করতো। ফলে এমনকি মোগল যুগেও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। কিন্তু ইংরেজরা ক্ষমতা নেওয়ার পরে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ধ্বস নামে। কারণ তাদের ছিল এটা উপনিবেশ। তাদের প্রথম দিকের শাসনকালকে শাসন না বলে শোষণ কালই বলা যায়। তারা এ সময়ে দু হাতে লুঠ করেছে এদেশের কাঁচামাল। ধ্বংস করেছে এদেশের অনেক দিনের পুরনো কুটির শিল্প। যার পরিণাম ইংরেজ শাসনের মাত্র দশ বছরেই দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। যার নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬)। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নিয়ে খুব বেশী বই নেই। সাহিত্যে মাত্র একটি উপন্যাস তার পটভূমিকায় রচিত। এটি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'। কিন্তু এটা অনেক পরে রচিত, কারণ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখা জন্ম লাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৩৮ সালের ২৬শে জুন বাংলা ১২৪৫, ১৩ই আষাঢ়। বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। দীর্ঘ দিন পরে ১৮৮২ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উপন্যাস 'আনন্দমঠ' আমাদেরকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং বাংলার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের মর্মান্তিক ঘটনা পটভূমিতে রেখে 'আনন্দমঠ' রচিত হয়েছিল।

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহতার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা উপন্যাসটিকে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদায় রূপায়িত করেছে। দুর্ভিক্ষের

এবং মৃত্যুর যে চিত্র আনন্দমঠের ক্যানভাসে চিত্রিত তা পাঠককে দীর্ঘদিন পরে মন্বন্তরের বেদনা সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবিয়ে তোলে। বঙ্কিমের বর্ণনাটা এরকম —

"গ্রাম খানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখিনা। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লিতে পল্লিতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচু অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখিনা, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখিনা, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা — তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায় — সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ু প্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্ল-কুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল। যে কিছু চৈত্রফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ

রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়। উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, নাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিত। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে ? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায় খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইঁদুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পালাইল, যাহারা পালাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।" [৫]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে বঙ্কিমের আনন্দমঠ একটা ঐতিহাসিক দলিলের ভূমিকা পালন করেছে। ইংরেজ শাসনে বসে ইংরেজের রাজ কর্মচারী হয়ে বঙ্কিম দুর্ভিক্ষের কারণটার উপর ইংরেজ শাসকের দায় তথাগতভাবে কোন রূপ রেখাপাত না করালেও তার ভয়াবহতাটা জীবন্ত ভাবে চিত্রিত করেছেন। বঙ্কিম Hunter এর Annals of Rural Bengal গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। Hunter ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল ঐতিহাসিক সত্য এবং সন্দেহাতীত। হান্টার-এর দুর্ভিক্ষের বিবরণ ছিল লোমহর্ষক, কিন্তু অতিরঞ্জিত নয়। Hunter মন্তব্য করেছেন -

"All through the stifling summer of 1770 the people went on dying ... they devoured their seed grain, they sold their sons and daughters, till at length no longer than any children could be found, they ate the leaves of trees and the grass of fields!" [৬]

আনন্দমঠ বঙ্কিমের একমাত্র উপন্যাস যেখানে ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শোষণের - একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের মত আনন্দমঠও একটি উদ্দেশ্যমূখী রচনা, যদিও শোষকদের প্রতি আক্রমণটা নীল দর্পনের মতো অতোটা সরাসরি নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে প্রথম সফল ঔপন্যাসিক, যিনি উপন্যাসের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালিয়েছেন। উপন্যাসের প্রকৃত বাস্তববাদিতার লক্ষণ আনন্দমঠ-এ পরিলক্ষিত।

"আনন্দমঠ বঙ্গদর্শন পত্রিকার চৈত্র ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং সে বৎসরই অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৮২ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম তখন ১৮৮০ ইংরেজী ৬ই নভেম্বর থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের - পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট - ১৮৮১ ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর ১৮৮১ ইংরেজী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ত্রিশ বছর এক মাস বঙ্কিম সরকারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন, লক্ষ করলে দেখা যাবে, বঙ্কিম আজীবন প্রায় একই পদে কাজ করে গেছেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু মাত্র ভারতীয় হবার জন্য কর্মক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ পদোন্নতি ঘটেনি, তাঁর অকাল অবসরের একটি কারণ সম্ভবত কর্তৃপক্ষের এই অবিচার, তাছাড়া তার স্বাধীনতা প্রিয়তা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও ইংরেজ সরকারকে খুশী করে নি, তাই তিনি স্বেচ্ছায় কর্ম থেকে অবসর নিয়েছিলেন।" [৭]

এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের একটা ভূমিকা রয়েছে। আঠারো শতকের 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' এবং 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'এ উপন্যাসের পটভূমি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যারা দেখেনি এবং যারা ইতিহাস এবং রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু সাহিত্য পিপাসু, তাঁরা 'আনন্দমঠ' পাঠে ব্রিটিশের স্বরূপ উপলব্ধি

করে। এ ছাড়া 'আনন্দমঠ' লেখার প্রায় ছয় বছর আগে রচিত জাতীয় চেতনার বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম' গানটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অর্ন্তভুক্ত করা হয়, এ গানটি পরবর্তী কালে নানা বিতর্ক তুলেছিল গানটি প্রসঙ্গে ড•বিষ্ণু বসু বলেছেন -

"একটি মাত্র গানকে কেন্দ্র করে একটি জাতির জীবনে এমন বিচিত্র তরঙ্গ সম্ভবত আর কোন দেশে দেখা যায়নি। গানটি বঙ্কিমের খুব প্রিয় ছিল। তিনি মনে করতেন গানটির গুরুত্ব সমকালের মানুষ ঠিক মতো না বুঝলেও ভবিষ্যতের বাঙালী উপলব্ধি করবে, অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলে - 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপযুক্ত পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়ে গানটি তিনি প্রয়োগ করেছিলেন, এ উপন্যাসের জনপ্রিয়তার মূলে এ গান-টির অবদান খুব কম নয় — কেউ কেউ বললেন, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রটি নাকি 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' নায়করা উদ্ভাবন করেছিলেন, এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র এ মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেই তার দেশ মাতৃকার বন্দনা করেছিলেন।" [৮]

মূলত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' এবং 'আনন্দমঠ' ভারতীয়দের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। বঙ্কিম উপন্যাসটি দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গ করেন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর নীলকর সাহেবদের, এবং তাদের স্বজাতিদের অত্যাচারের চিত্রেরই আরেকটা পিঠ 'আনন্দমঠ'। চাষীদের নীল সাহেবরা যখন জোর করে ধানের এবং ফসলের পরিবর্তে নীল চাষে বাধ্য করে নামমাত্র মূল্যে নীল খরিদ করতো তখন - সে কৃষকের অর্থনৈতিক দুর্দশার পাশাপাশি খাদ্যের উৎপাদন কমে এলাকায় স্থায়ী দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়, যার ফলে আমরা দেখি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেও একটার পর একটা মন্বন্তর এ উপমহাদেশে লেগেই ছিল। 'আনন্দমঠ'এ ঐতিহাসিক অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন -

"১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই, তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ট নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্য কুল কলঙ্ক মীর জাফরের উপর, মীর জাফর আত্মরক্ষায়

126673 10 AUG 1999
Bengal Library
Raja Rammohunpur

অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে ? মীর জাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লেখে, বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য, কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাহারা এক এক কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" ৯

তবে এখানে কিছু তথ্যগত ভুল আছে। কারণ ১৭৬৫ সালে মীর জাফর মারা যায়। অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মীর জাফর ছিল না। কিন্তু বঙ্কিম বলেছেন, মীর জাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। এ কথা বঙ্কিমের ভুলবশত হতে পারে আবার ইচ্ছাকৃতও হতে পারে। কারণ মীর জাফরের উপর বাঙ্গালীর ক্রোধ প্রকাশ করতে বঙ্কিম মীর জাফরের দায়িত্বহীনতা উপস্থাপন করেছেন হতে পারে। তবু চাকরি সূত্রে বঙ্কিম ইংরেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে ভয় করবার সঙ্গত কারণও ছিল। 'আনন্দমঠ'এ বঙ্কিম ইংরেজদেরকে শত্রু না বলে মিত্রই বলেছেন তাই।

"এ ছাড়া বঙ্কিম জানতেন যে, অস্ত্র সুসজ্জিত রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে হলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন। এ বাহিনী যে সমাজের অভ্যন্তরে থাকবে তা সম্ভব নয়, শাসকরা তাকে কখনো টিকতে দেবে না, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের তাই অরণ্যেই থাকতে হবে। অসাধারণ সাহিত্যিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই আরণ্যক অবস্থানকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। ভক্তি করতে হলে ভক্তির যোগ্য বীরও আবশ্যক। সেই বীরও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সেই বীরে অলৌকিক মহিমা ও আরোপিত হয়েছে। কিন্তু এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে কোন চূড়ান্ত বিজয়ে উত্তীর্ণ হতে তিনি দেখালেন না।" ১০

হান্টার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে লিখেছেন -

"The Famine ..., the mortality the beggary, exceed all description. Above one-third of the inhabitants have perished in the once plentiful province of Purneah, and in other parts the misery is equal." ১১

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দশ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু হয়েছিল বলে হান্টার 'Annals of Rural Bengal(p.35)' বইতে উল্লেখ করেছেন। মূলত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মৃত্যুর সংখ্যাটা অজ্ঞাত। ঐতিহাসিকের মন্তব্য -

"মন্বন্তরে বাংলা বিহারের এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু ১৭৭০ সনে বাংলা বিহারের মোট জনসংখ্যার হিসাব দুষ্প্রাপ্য বলে এই এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ সঠিক ভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।" [১২]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলা বিহারের অর্থনৈতিক ক্ষতিটা হল সুদূর প্রসারী। এর ফলে বাংলা বিহার দীর্ঘ দিনের জন্য চির দরিদ্র এবং চির দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হয়। অর্থনীতিবিদরা লক্ষ্য করেছেন এ মন্বন্তর সব চেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছে শিল্প এবং ফসলের উৎপাদনের উপর।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ধ্বংস করেছিল বাংলা বিহারের অর্থনীতি। তাঁতি ও তুলো উৎপাদকের মৃত্যুতে বস্ত্র শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে। মুর্শিদাবাদে রেশম শিল্পের শিল্পী ও গুটি সংগ্রাহকদের মৃত্যুতে রেশমের উৎপাদন কমে যায়। ঐতিহাসিকরা দীর্ঘদিন পরে এবং নতুন গবেষণা করে সে একই কথা বলছেন -

"প্রকৃতির অভিশাপের কথা বাদ দিলেও একথা বলা যায় যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশি বিদেশি উভয়মুখি শোষণের প্রবল চাপের একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণ, যে বিস্ফোরণে বিনষ্ট হয়েছিল হাজার হাজার গ্রাম। ভেঙে পড়েছিল অর্থনৈতিক কাঠামো, পরিবর্তন এসেছিল রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিয়তিতে, এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষনের ফাঁস সাধারণ মানুষের গলায় কিভাবে চেপে বসতে পারে তার প্রকৃষ্ট নজির ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছেতো বহুবার কিন্তু সাধারণ মানুষকে এমন সর্বনাশা মাশুল হয়তো আর কখনো গুণতে হয় নি।" [১৩]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রধান কারণটি দেখিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী লেখক ইয়ংহাস্‌ব্যান্ড লিখেছেন -

"তাহাদের (ইংরেজ বণিকগণের — সুপ্রকাশ রায়) মুনাফা শিকারের পরবর্তী উপায় হইল চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা। তাহারা নিশ্চিত ছিল যে,

জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যটির জন্য তাহারা যে মূল্যই চাহিবে তাহাই পাইবে। ... চাষীরা তাহাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফসল অপরের গুদামে মজুত হইতে দেখিয়া চাষবাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা ইংরেজ বণিকগণের এক চেটিয়া দখলে চলিয়া গেল। ... খাদ্যের পরিমাণ যত কমিতে লাগিল ততই দাম বাড়িতে লাগিল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চিরদুঃখময় জীবনের উপর পতিত হইল এই পুঞ্জীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু ইহা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র।"
... এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তাহা এমন কি ভারতবাসীরাও আর কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই।"

"চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, তাহাদের সকল আমলা -গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেই খানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। এই জঘন্যতম ব্যবসায় মুনাফা হইল এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণে যে, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুর্ভিক্ষ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৬০ হাজার পাউন্ড। (দেড় লক্ষাধিক টাকা)য়ুরোপে পাঠাইয়াছিলেন।" [১৪]

"... বঙ্গদেশের সমগ্র ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ এরূপ একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে, তাহা মানব সমাজের সমস্ত অতিতকাল ব্যাপিয়া ব্যবসা-নীতির এই ক্রূর উদ্ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, আর পবিত্রতম ও অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকার সমূহের উপর কত ব্যাপক, কত গভীর ও কত নিষ্ঠুরভাবে অর্থ - লালসার উৎকট অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এই নতুন অধ্যায়টি তাহারও একটি কালজয়ী নিদর্শন হইয়া থাকিবে।" [১৫]

বলা যায় এদেশে ইংরেজ শাসনের ফলে যে জিনিষটি অক্টোপাসের মতো লেগে ছিল, তা হচ্ছে মন্বন্তর। ইংরেজ শাসনের বা শোষণের শুরু এদেশে ছিয়াত্তরে মন্বন্তর দিয়ে আর শোষণের শেষ পঞ্চাশের মন্বন্তর দিয়ে। মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো মন্বন্তর ঘটেছে বিশ বার। আর আকাল বলতে যা বুঝায় তা একশ্রেণীর সুবিধাবাদী চাটুকার ছাড়া প্রায় সবার নিকট চিরকালই লেগে ছিল।

ইংরেজ শাসনের প্রায় দুইশত বৎসরের পুরো সময়টাতে বাংলাদেশে মন্বন্তরটা সিন্দাবাদের ঘাড়ে চেপে বসা বুড়ো দৈত্যের মতো সর্বদা চেপে ছিল। এই একশত নব্বই বৎসর সময়কালকে ভারতীয় ইতিহাসে 'মন্বন্তরের কাল' বলে অভিহিত করা যায়। ভারত বর্ষ মুসলমানদের আক্রমণের ফলে পরাধীন হয়েছিল মুসলিম শাসকদের, কিন্তু পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে এদেশ পরাধীন হলো দুর্ভিক্ষের, ভাগ্যের এবং শোষণ সমাজ ব্যবস্থার। ইংরেজ শাসন এদেশে আধুনিক সভ্যতার আলো দিয়েছে বটে তবে তা ছিল পরাধীনের জন্য বন্টিত আলো। অপরদিকে শোষণের যে তীব্রতা ইংরেজরা দেখিয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা যেন কসাইয়ের ডিগ্রিকে স্পর্শ করে। মুনাফার জন্য এমন কোন অপকর্ম নেই, যা এই বেনিয়া শ্রেণী করেনি। প্রতারণা, হঠকারিতা, উৎকোচ গ্রহণ, শোষণ ইত্যাদির যে বৈশিষ্ট্য এদেশে ইংরেজ শাসনকে কালিমাময় করেছে, তা এমন কিছু নয় মুনাফার জন্য মন্বন্তর সৃষ্ট কোটি কোটি মানুষ ধুনের কাছে।

এদেশে ইংরেজ শাসনের সূত্র ধরে সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোই বেশী ভোগ করেছিল বাঙালীরা। কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠলে, বাঙালীরা একদিকে ইংরেজ জীবন যাত্রার সাথে পরিচিত হয়। অন্যদিকে ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণের ফলে দারিদ্র্য এবং বার বার দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। ইংরেজদের প্রভাবে উনবিংশ শতকের শুরুতে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় জন্ম নেয় যে উদার চিন্তা ভাবনা, জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের বিকাশ হয় এসব চিন্তাধারা বাংলায়ও প্রবেশ করে। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অনেক বাঙালী সরকারী চাকুরী লাভ করে। উইলিয়াম বেন্টিক (১৮২৮-৩৫) গভর্ণর হয়ে এলে বাঙালীর জন্য ইংরেজী শিক্ষার দিগন্ত খুলে যায়। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা সম্প্রসারণের পক্ষে লর্ড মেকলে একটি শিক্ষানীতির

প্রস্তাব করেন। বেন্টিংক ১৮৩৫ সালে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর থেকে সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজী বিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় এবং আইন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার বাইরে সমগ্র বাংলায় ও আধুনিক শিক্ষানীতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি কলেজ, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ, ১৮ ৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উডের শিক্ষানীতির ফসল হিসাবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত বিষয় বিচার করলে দেখা যায় বাংলার অর্থনৈতিক অবনতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দায়ী এবং দাবিদার। কোম্পানীর শাসনের শুরুতেই নেমে এসেছিল ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ নামের ঐতিহাসিক দুর্যোগ। যার সত্রিয় হোতা - প্রকৃতি নয়, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হর্তাকর্তারা। অপর দিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের শেষ দিক, বাংলা এবং ভারতের ইতিহাসে 'উন্নয়নের যুগ' হিসাবে পরিচিত। এসময় রেলপথ নির্মাণ করা হয়। এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু ইংরেজদের কুশাসনে বাংলার সাধারণ বনিকদের বাণিজ্য দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র শিল্প ও কলকারখানা এবং হস্ত ও কুটির শিল্প ক্রমে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। হস্ত উৎপাদিত পণ্য বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বরপুষ্ট বৃটিশ পণ্যের হাতে মার খায়, ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ পণ্য। ফলে এদেশের উৎপাদিত পণ্য বাজার ছাড়া হয়ে মিল কারখানা বন্ধ হওয়া শুরু হলে কৃষকের মত এ দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও কারিগররা কর্মচ্যুত হয়ে ধীরে ধীরে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। বাংলার মসলিন, সুতী বস্ত্র, রেশমি বস্ত্র এবং কৃষিজাত দ্রব্য মুঘল, পাঠান, আরমানী এবং ইউরোপীয় বণিকদের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বে যে রপ্তানী হত কোম্পানীর যুগে এসে অন্যান্য বণিক শ্রেণীর পরিবর্তে ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার প্রয়োগ হলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী এসব দ্রব্যের উৎপাদকরা দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিযোগিতামূলক চেতনা না থাকায় ইংরেজরা নামমাত্র মূল্যে, কখনো জোর পূর্বক এবং কৌশল পূর্বক বাংলার কৃষি পণ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল বিনেতে পাচার করতে থাকলে উৎপাদকরা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান না হবার ফলে উৎপাদনে ধ্বস নেমে আসে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীতে উৎপাদন যখন ক্রমানুয়ে বৃদ্ধি পায়, তখন বাংলার উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানীতে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ইউরোপের তৈরী জিনিস পত্র

কম শুল্কে এদেশে আমদানী করা হয়, এসব দ্রব্য সস্তা ছিল বলে সাধারণ ক্রেতারা দেশীয় পণ্যের বদলে এগুলো কেনার দিকে ঝুঁকতে থাকলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। বাংলার উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানির উপর অধিক শুল্ক ধার্য করা হলে আন্তর্জাতিক বাজারে এসব দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে ক্রমানুয়ে চাহিদা কমতে থাকে। অর্থনৈতিক শোষণের উপর আলোকপাত করে ঐতিহাসিক বলেছেন -

"প্রকৃতপক্ষে বাংলার আর্থিক এবং সেই সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয়েছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, এ ধারা পরিণতি লাভ করেছে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এ যুগে (১৭৫৭-১৭৭২) বাংলা থেকে ব্যাপক ভাবে আর্থিক নিষ্কাশনের (Economic drain) শুরু। ১৭৫৭ থেকে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্কাশনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮, ৪০০, ০০০ পাউন্ড। বাংলার আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের কুক্ষিগত।"[১৬]

কোম্পানীর শোষণের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হলে বাংলার কৃষি জমির এক তৃতীয়াংশ জমি যেমন জঙ্গলে পরিণত হয়, তেমনি ইংরেজদের অর্থনৈতিক কুব্যবস্থায়, এদেশের এতদিনের অনেক লাভবান শিল্প ও স্তব্ধপে পরিণত হয়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরটি অবশ্যম্ভাবি ছিল। কারণ এদেশের পণ্য ইংরেজরা কোম্পানীর লগ্নি নামে কৃষকদের থেকে জোরপূর্বক নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে তা ইংল্যান্ডের বাজারে রপ্তানী করে। এ ছাড়া এতদিন কৃষকগণ সমবেতভাবে খাজনা দিত। কিন্তু এবার তাদের খাজনা দিতে হয় ব্যক্তিগত ভাবে এবং মুদ্রার আকারে। কৃষকরা খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য বৎসরের খাদ্য ফসল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এ সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে চাউলের একচেটিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অসংখ্য ব্যবসাকেন্দ্র খুলে বসে। এই ভয়ঙ্কর ব্যবসা ছিল এই দুইটি প্রদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন নিয়ে খেলা। বিপুল মুনাফার লোভে ইংরেজরা এই নিষ্ঠুর খেলা আরম্ভ করে। ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গে ফসল ক্রয় করে মজুত করে রাখে এবং পরে সময় বুঝে অর্থাৎ দাম বৃদ্ধি পেলে তা ঐ চাষীদের নিকটই বিক্রয় করে। এই ব্যবসার ফলে ইংরেজ বণিকগণ শাসনের প্রথম হতে ভারতের শস্য-ভান্ডার কথিত বাংলা ও বিহারকে এক স্থায়ী দুর্ভিক্ষের

দেশে পরিণত করে। পরবর্তীকালে এ ব্যবসা স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং এটাই সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠে।

এ সময় দুর্ভিক্ষ সাধারণ ঘটনা হওয়ার কথা, কারণ তখন শাসন ব্যবস্থার নীতি ছিল প্রজারা শাসকদের হালের গরু, যারা রাতদিন খাটবে- শাসকদের খোরাকী তৈরীর জন্য।

ছিয়াত্তরের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতাকে শাসক মজুতদাররা একটা কলঙ্ক হিসাবে না নিয়ে মুনাফা লাভের একটা অভিজ্ঞতা হিসাবে গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তারা এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে এবং মুনাফার চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে।

B.M.Bhatia লিখেছেন -

"The Bengal famine was a tragedy in unpreparedness,
The food situation in India had been allowed,
due to neglect, to grow from bad to worse." ১৭

ভাটিয়ার মতে বাংলার মন্বন্তর ছিলো প্রস্তুতিহীনতার মধ্যে একটি বিয়োগান্তক ঘটনা। শুধুমাত্র অবহেলার কারণেই ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপতর অবস্থায় পৌঁছে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গে দেখি পঞ্চাশের মন্বন্তর রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করে দিল ভারতের ইতিহাসে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জন অসন্তোষ উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে, বৃহৎ জনগোষ্ঠি ইংরেজ শাসনকে উৎখাত করার জন্য জোর তৎপরতা চালায়। কারণ তাদের উপলব্ধি হল, ইংরেজ এবং তাদের বরপুষ্ট জমিদার থেকে মুক্তি লাভের জন্য স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জাপানের সঙ্গে হাত মেলাবার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন, যদিও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জাপানের প্রবেশ মানে আর একটা শত্রু ডেকে আনা। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের পুরোটা কেটেছে দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে। বস্তুত স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ লাভ করল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং দুর্ভিক্ষ (যখন দুর্ভিক্ষ ছিল না - তখন ছিল দুর্ভিক্ষের প্রস্তুতির সময়) থেকে মুক্তি, কারণ স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথেই ভারতবর্ষ আর বড় ধরণের কোন দুর্ভিক্ষের স্বীকার হয়নি। নিম্নে আমরা দেখতে পাই তার চিত্র।

যেমন -

"বৃটিশ শাসনের পূর্বের দুর্ভিক্ষ সমূহ -

কাল	স্থান ও বর্ণনা	কারণ ও মৃত্যুসংখ্যা
একাদশ শতাব্দী (দুইটি)	স্থানীয়	অনাবৃষ্টি
ত্রয়োদশ শতাব্দী (একটি)	দিল্লীর নিকট	অজ্ঞাত
চতুর্দশ শতাব্দী (তিনটি)	স্থানীয়	যুদ্ধের জন্য শস্যহানি
পঞ্চদশ শতাব্দী (দুইটি)	ঐ	ঐ
ষোড়ষ শতাব্দী (তিনটি)	স্থানীয়	অনাবৃষ্টি
সপ্তদশ শতাব্দী (তিনটি)	প্রায় সর্বত্র	অরাজকতা, সেচের অভাব ও অনাবৃষ্টি
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ(চারটি)	স্থানীয়	ঐ

বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগ (১৭৫৭-১৮০০)

১৭৬৯-৭০	'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' — বিহার ও বঙ্গদেশ	ইংরেজ বণিকদের খাদ্য শস্যের ব্যবসা, অনাবৃষ্টি বঙ্গদেশে এক কোটি ও বিহারে ত্রিশ লক্ষাধিক নরনারীর মৃত্যু
১৭৮৩	মাদ্রাজ ও বোম্বাই	মৃত্যু সংখ্যা অজ্ঞাত
১৭৮৪	উত্তর ভারত	ঐ
১৭৯২	মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও মারবাড়	ঐ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

১৮০২	বোম্বাই	মৃত্যুসংখ্যা অগণিত
১৮০৩-৪	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজপুতানা	অজ্ঞাত

১৮০৫-৭	মাদ্রাজ	মৃত্যুসংখ্যা বিপুল
১৮১১-১৪	ঐ	সামান্য
১৮১২-১৩	রাজপুতানা ও পাঞ্জাব	বিশ লক্ষাধিক
১৮২৩	মাদ্রাজ	বিপুল সংখ্যা
১৮২৪-২৫	বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	অজ্ঞাত
১৮৩৩-৩৫	মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল ও বোম্বাই	অগণিত
১৮৩৭-৩৮	উত্তর-ভারত	দশ লক্ষাধিক

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ

১৮৫৪	মাদ্রাজ	অজ্ঞাত
১৮৬০-৬১	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব	পাঁচ লক্ষ
১৮৬৫-৬৬	উড়িষ্যার ছয়টি জেলা, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও মাদ্রাজ	যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার, ১ লক্ষ ৩৫ হাজার, ৪ লক্ষ ৫০ হাজার
১৮৬৮-৬৯	রাজপুতানা,	১২ লক্ষ ৫০ হাজার
	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৬ লক্ষাধিক
	পাঞ্জাব	৬ লক্ষ
	মধ্য-ভারত	২ লক্ষ ৫০ হাজার
	বোম্বাই	অজ্ঞাত
১৮৭৩-৭৪	বঙ্গদেশ, বিহার, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	ঐ
১৮৭৬-৭৭	বোম্বাই	৯ লক্ষ
	হায়দরাবাদ	৭০ হাজার
	মাদ্রাজ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অযোধ্যা	মোট ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার
	মহীশূর	১১ লক্ষ

১৮৬৩	দাক্ষিণাত্য, বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চল	
	মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, উত্তর-পশ্চিম	
	সীমান্ত অঞ্চল	X
১৮৬৪	বঙ্গদেশ, বিহার, ছোটনাগপুর ও	
	মাদ্রাজের কতিপয় জেলা	X
১৮৬৬-৬৭	মধ্য-ভারত	X
১৮৬৮-৭০	বিহার, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, মাদ্রাজ,	
	কুমাউন ও গাড়োয়াল	১৫ লক্ষ
১৮৯১-৯২	মাদ্রাজ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও	
	বঙ্গদেশ	১৬ লক্ষ ২০ হাজার
১৮৯৫-৯৭	বুন্দেলখণ্ড, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	
	প্রদেশ, অযোধ্যা, বঙ্গদেশ ও	
	মধ্য-ভারত	৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার
১৮৯৯-১৯০০	ভারতের প্রায় সর্বত্র	২৫ লক্ষ
১৯০১	গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই,	
	কর্ণাটক, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের	
	দক্ষিণাঞ্চল	৭ লক্ষ ৫ হাজার

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫৪-১৯০১ – এই সাতচল্লিশ বৎসরে) বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার।" [১৮]

১৯৪৭ পরবর্তী দুর্ভিক্ষের হিসাব দেয়া হল -

"খ্রীস্টাব্দ	মন্বন্তর-পীড়িত স্থান	মন্বন্তরের কারণ	মন্বন্তরের পরিণতি
১৯৬৫	বিহার	খরা	ত্রাণকার্যে আশাতীত সাফল্য সত্ত্বেও সহস্রাধিক মৃত্যু
* ১৯৭৪	বাংলাদেশ	বন্যা ও খাদ্য রপ্তানি	ব্যাপক অসন্তোষ ও বহু লোকক্ষয়" [১৯]

এ থেকে স্পষ্ট হল ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ কি ? কারণ দেশ স্বাধীন হওয়াতে আর উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষ নেই। তবে কখনো যদি আবার শোষণ ব্যবস্থা সেই আগের পর্যায়ে পৌঁছে, তবে আবার আগের দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি শুরু হবে।

এছাড়া আমরা দেখি পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে। প্রথমেই বলে রাখা যায় মন্বন্তর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তার ফলে বাজারে প্রায় জিনিসের যে দাম বাড়ে তা আর পূর্বের স্থানে ফিরে আসে না। এক শ্রেণীর লোকের হাতে হঠাৎ এতো কাঁচা টাকা এসে যায়, যা বাজারের ভারসাম্য ভেঙে দেয়। মন্বন্তরের ফলে কিছু মানুষের বড় ধরণের অর্থনৈতিক উত্থান ঘটলেও বৃহৎ জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক পতন ঘটে। যুদ্ধের ফলে বিশেষত খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মজুতদারী করে কিছু নিম্নবিত্ত, উচ্চবিত্তের সারিতে গেলেও মন্বন্তরের ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বেশীর ভাগ মানুষের শোচনীয় পতন ঘটে। তাদের যে সচ্ছলতা ছিল, তার স্থানে তাদেরকে এসে নির্ভর করতে হয় শ্রমনির্ভর মজুরী এবং চাকুরীর উপর। যে সামান্য জমি, বসত বাড়ী তাদের ছিল, যা তাদের বিক্রি করতে হল কমমূল্যে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে সে সর্বহারারা তাদের অর্থনৈতিক পতনের ফলে সে সম্পদ আর ক্রয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে তাদের বেশীর ভাগই হয়ে যায় বস্তিবাসী বা ভাড়াটে। তবে স্বাধীনতার ফলে এবং বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্ব-ব্যাপী যন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতির ফলে নিম্নবিত্তরা কারখানায় শ্রমবিক্রি করে বাঁচার একটা অবলম্বন পায়। ভারতবর্ষের পঙ্গু অর্থনীতিতে স্বাধীনতা একটা আশার সঞ্চার করে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

----- 0 -----

উল্লেখপঞ্জী :-

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ইতিহাস', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫) পুনর্মুদ্রণ ১৩৬১, পৃ.১-২।

২। তদেব, পৃ.১২৪।

৩। Karl Marx : 'Future Result of British Rule in India' (উদ্ধৃত এবং অনুবাদ - সুপ্রকাশ রায় : 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণ-তান্ত্রিক সংগ্রাম', বুক ওয়ার্ল্ড, তৃতীয় সংস্করণ, (পুনর্মুদ্রণ)নভেম্বর ১৯৯৬, পৃ.৮)।

৪। Fourth Parliamentary Report 1773, page-535.
(উদ্ধৃত সুপ্রকাশ রায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.২ থেকে।)

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বঙ্কিম রচনাবলী', (উপন্যাস সমগ্র, প্রথম খণ্ড, তুলি কলম, কলকাতা ১৯৮৬, পৃ.৬৭০।

৬। W.W.Hunter : 'The Annals of Rural Bengal', Vol.I, Smith Elder, London, 1872, p.26-27.

৭। ড. বিষ্ণু বসু : 'ভূমিকা', বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত সংস্করণ।

৮। তদেব।

৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'আনন্দমঠ', বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ.৬৭৬।

১০। নাজমা জেসমিন চৌধুরী : 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮০, পৃ.৩০৬।

১১। W.W.Hunter :- Ibid, p.20-21.

১২। নিখিল সুর : 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ.১২।

১৩। তদেব, পৃ.৩১।

১৪। Young Husband : 'Transation in India (1768)pp.123-124,131
(উদ্ধৃত ও অনুবাদ সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৩-১৪।

১৫। Young Husband : Ibid,p.131, উদ্ধৃত তদেব।

১৬। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় : 'প্রাক পলাশী বাংলা' (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭) কে·পি·বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ·৮।

১৭। B.M.Bhatia : 'Famine in India' - 1860-1965',Bombay, 2nd Edition, 1967, p.309-310.

১৮। S.K. Chatterjee : 'The Starving Millions' p.7-11 এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত 'দেশের কথা'নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই দুর্ভিক্ষের বিবরণগুলি রয়েছে। (উদ্ধৃত - সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ·১৭৬-১৭১)।

১৯। ড· বিনতা রায়চৌধুরী : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য', সাহিত্যলোক, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃ·৪-৫।

১৯*। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে বিনতা রায়চৌধুরী কারণ দেখিয়েছেন— বন্যা এবং খাদ্য রপ্তানী। বন্যা অবশ্য একটা কারণ ছিল।

এর সাথে অমর্ত্য সেন মূল কারণ দেখিয়েছেন -
...."Bangladesh was already chronically dependent on import of food abroad and despite the famine conditions the government succeeded in importing less food grains in 1974 than in 1973.(poverty and famine, Oxford, 1981 P-134 - 35). কিন্তু দৈনিক ইত্তেফাক থেকে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নির্ভীক স্বীকারোক্তি বাংলাদেশ অবজারভার থেকে উদ্ধৃত করে Martin Ravallion তাঁর Markets and Famines (Oxford-1987) গ্রন্থের 'Rice Markets in Bangladesh during the 1974 Famine' প্রবন্ধে বলেন - "At the time, many paople blamed 'hoarders'. For example, the influential Bangladeshi news paper, Daily Ittefaq' Claimed on 12 May 1974, that ' .... hoarders, profiters and black-Marketeers were creating the crisis condition's. When the Prime Minister of Bangladesh, Mujibur Rahman, officially declared famine he was quoted as saying

that " ... a group of sharks, hoarders, smugglers profiteers and black Marketers were trading on human miseries (The Bangladesh Observer, 23 Sept. 1974) বঙ্গবন্ধুর এই স্বীকারোক্তি মহত্তার পরিচয় - যা প্রশংসনীয়। এই দুর্ভিক্ষে সরকারী হিশাবে ২৬,০০০ মানুষ মারা যায়।

*** বি.দ্র. — এ গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঐতিহাসিক তথ্য গুলি নেয়া হয়েছে, শ্রী প্রভাতাংশু মাইতির 'ইউরোপের ইতিহাসের রূপরেখা', বাংলাদেশের নূরুন নাহার বেগমের 'মানুষের ইতিহাস' (আধুনিক যুগ), সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', পূর্ণেন্দু পত্রীর 'কলকাতা সংক্রান্ত'(প্রবন্ধের বই) নিশীথ, আর. রায়ের 'এ সর্ট হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া',3 বিভিন্ন গবেষকের লিখিত 'ইংরেজ আমলের ইতিহাস' এবং 'ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক' কিছু টেক্সট বুক (পাঠ্য বই). থেকে।